# শিশুদের অ্যাজমা

শিশুদের হাঁপানি রোগ অনেক কারণে হয়ে থাকে। একই সঙ্গে একাধিক কারণ এ রোগের জন্য দায়ী মনে করা হয়...

**ডাঃ গোবিন্দ চন্দ্র দাস**
*সিনিয়র কনসালটেন্ট ও বিভাগীয় প্রধান*
*অ্যাজমা ও এলার্জি রোড় বিশেষজ্ঞ*
*শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী হাসপাতাল, ঢাকা*

সারা বিশ্বের প্রায় ১০ কোটি লোক শ্বাসনালীর সচরাচর সমস্য অ্যাজমায় আক্রান্ত হয়। এদের ৯০% এরও বেশি অত্যাধুনিক চিকিৎসা পায় না এবং অনেক রোগী মারা যায়। এ রোগ ৮০% প্রতিরোধ করা সম্ভব, যদি আধুনিক চিকিৎসা ও ডাক্তারের তদারকির মাধ্যমে অ্যাজমা নিয়ন্ত্রণের শিক্ষা দেয়া যায়।

শিশুদের হাঁপানি রোগ অনেক কারণে হয়ে থাকে। একই সঙ্গে একাধিক কারণ এ রোগের জন্য দায়ী মনে করা হয়। শিশুদের হাঁপানিতে বেশি আক্রান্ত হবার কারন হিসেবে মনে করা হয় শ্বাসনালীর হাইপার রেসনসিভনেসকে।

আসলে বড়দের তুলনায় শিশুদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা অনেকটা কম। তাই এ বার বার রেসপিরেটরি ট্রাক্ট সংক্রামণজনিত কারণে সর্দিকাশি হওয়ার প্রবণতা বেশি। কিছু কিছু শিশুর রেসপিরেটরি ট্রাক্ট সংক্রমনের ফলে শ্বাসনালোগুলোতে হাইপার ইরিটেবিনিটি দেখা দেয় অর্থাৎ অতিমাত্রায় সংবেদনশীল হয়ে পড়ে। এই ক্রনিক ইনফ্লামেশনের ফলে বাইরে থেকে কোনো কিছু (ঠান্ডা, মাইট, ধুলো, ফুলের রেণু ইত্যাদি) শ্বাসনালীতে ঢুকলেই শুরু হয় সংকোচণ এর ফলস্বরূপ হাঁপানি। তবে শিশুদের হাঁপানির লক্ষণ নিয়ে আসলে চিকিৎসককে ভীষণ সজাগ থাকতে হয়। কারণ অনেক সময় লেবুর দানা, বোতাম, পুঁতি ইত্যাদিবাবা মায়ের অজান্তে শিশুদের নাক মুখ দিয়ে ঢুকে শ্বাসনালীতে আটকে থাকতে পারে। এর ফলে সর্দি, কাশি, জ্বর, শ্বাসকষ্ট ইত্যাদিতে শিশুটি ভুগতে পারে।

জেনেটিক কারণে কারো কারো বেশি হয়ে থাকে। ঘরবাড়ির ধুলোময়লায় মাইট

*শিশুর স্বাস্থ্য পরিক্ষা করছেন ডাঃ গোবিন্দ চন্দ্র দাস*

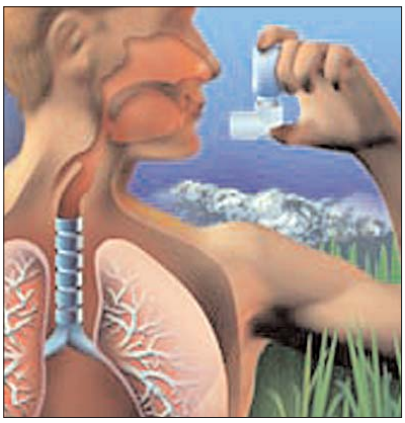

পোকা, ফুল বা ঘাসের পরাগ রেণু, পাখির পালক, জীবজন্তুর পশম, ছত্রাক, কিছু কিছু খাবার, কিছু কিছু ওষুধ, নানা রকম রাসায়নিক পদার্থ ইত্যাদি থেকে এলার্জি জনিতঅ্যাজমা হয়ে থাকে।

### অ্যাজমায় কেন এই শ্বাস কষ্ট?

শিশুদের শ্বাসনালী গুলো খুবই ক্ষুদ্র। ২ মিঃ মিঃ থেকে ৫ মিঃ মিঃ ব্যাস বিশিষ্ট। চারদিকে মাংসপেশী পরিবেষ্টিত। এই ক্ষুদ্র শ্বাসনালীর ভেতর দিয়ে স্বাভাবিক অবস্থায় খুব সহজেই বাতাস আসাযাওয়া করতে পারে। যদি কখনো এলার্জিক বা উত্তেজক কিছু শরীরে প্রবেশ করে তখন শ্বাস নালীর মাংসপেশীগুলো সংকুচিত হয়। ফলে শ্বাসনালী সরু হয়ে যায়। তাছাড়া উত্তেজক জিনিসের প্রভাবে শ্বাসনালীর গ্রন্থি থেকে নিঃসৃত হয় আঠালো মিউকাস জাতীয় কফ। আর ইনফেকশনের কারণে শ্বাসনালীর ভেতরের দিককার মিউকাস আবরণী ফুলে ওঠে। ফলে শ্বাস নিতে এবং ফেলতে কষ্ট হয়। আর মিউকাস জাতীয় আঠালো কফ উঠিয়ে ফেলার লক্ষ্যে অনবরত কাশি হতে থাকে। কখনো কখনো এই শ্বাসনালী এত সরু হয় যে, বাতাস বায়ুথলিতে পৌঁছায়না। তখন শরীরে অক্সিজেনের অভাব হয়। এটা খুবই মারাত্মক অবস্থা। এ অবস্থা বেশিক্ষণ স্থায়ী হলে অক্সিজেনের অভাবে রোগীর মৃত্যু ঘটতে পারে।

### বংশগতভাবে অ্যাজমার রিস্ক কতটা?

মাতৃকুলে হাঁপানি থাকলে তিনগুণ বেশি রিস্ক আর পিতৃকুলে থাকলে রিস্ক কম। মায়ের হাঁপানি থাকলে মোটামোটিভাবে বলা যায় তিন সন্তানের মধ্যে একটির হাঁপানি, একটির আপাত সুস্বাস্থ্য এবং একটির অস্বাভাবিক শ্বাসনালীর সংকোচন থাকতে পারে। শেষেরটির হাঁপানি না হয়ে সর্দি কাশির প্রবণতা থাকতে পারে।

### কিভাবে এ রোগ চিহ্নিত করা যায়?

অনেক শিশুর প্রায়ই ঠান্ডা লাগে। অর্থাৎ নাকদিয়ে পানি পড়ে কাশি হয়। বিশেষ করে রাতে। যদিও মায়েরা এ লক্ষণগুলোর অধিকাংশ নিউমোনিয়া বলে ধরে নেয়। এর কারণ অধিকাংশ সময় চিকিৎসকরা মায়েদের নিউমোনিয়া বলেই চালিয়ে দেন। আসলে এগুলো শিশুদের অ্যাজমার প্রাথমিক লক্ষন। পরে অবশ্য বড়দের মতো অন্যান্য লক্ষণ গুলোও দেখা দেয়। যেমন -

1. বুকের ভেতর বাঁশির মতো সাঁই সাঁই আওয়াজ
2. শ্বাস নিতে ও ছাড়তে কষ্ট
3. দম খাটো অর্থাৎ ফুসফুস ভরে দম নিতে না পারা
4. ঘন ঘন কাশি
5. বুকে আঁটসাঁট বা দমবন্ধ ভাব
6. রাতে ঘুম থেকে উঠে বসে থাকা

**প্রয়োজনীয় পরীক্ষা-নিরীক্ষা কী?**

রক্ত পরীক্ষা বিশেষত ইয়োসিনোফিলের মাত্রা বেশি আছে কি-না তা দেখা। সিরাম আইজিই মাত্রা সাধারণত অ্যাজমা রোগীদের ক্ষেত্রে আইজিইএর মাত্রা বেশি থাকে। স্কিন প্রিক টেস্ট: এই পরীক্ষায় রোগীর চামড়ার ওপর বিভিন্ন এলারজেন দিয়ে পরীক্ষা করা হয় এবং এই পরীক্ষায় কোন কোন জিনিসে রোগীর অ্যালার্জি আছে তা ধরা পড়ে। বুকের এক্স-রে অ্যাজমা রোগীদের ক্ষেত্রে চিকিৎসা শুরুর আগে অবশ্যই বুকের এক্স-রে করে দেখা প্রয়োজন যে, অন্য কোনো কারণে রোগীর শ্বাসকষ্ট হয় কি না।

**সমন্বিতভাবে অ্যাজমা চিকিৎসা পদ্ধতি**

অ্যাজমা চিকিৎসার তিনটি প্রধান উপায়

1. এলাজেন পরিহার: হাঁপানির হাত থেকে মুক্তি পাওয়ার সবচেয়ে সহজ পন্থা হলো যে জিনিষে এলার্জি তা যতদূর সম্ভব এড়িয়ে চলা। তাই অ্যাজমা রোগীদের প্রথমেই এলার্জি টেস্ট করে জানা দরকার তার কিসে কিসে এলার্জি হয়।

2. ঔষধপত্র: নানা ধরনের হাঁপানির ওষুধ আছে। প্রয়োজন মতো ওষুধ ব্যবহার করে রোগী সুস্থ থাকতে পারেন। সাধারণত দুই ধরণের ওষুধ ব্যবহার করা হয়।

ক) শ্বাসনালীর সংকোচন প্রসারিত করতে ব্রঙ্কোডাইলেটর যেমন- সালবিউটামল, থিউফাইলিন, ব্যামবুটারল। এ ওষুধগুলো টেবলেট, সিরাপ, ইনজেকশন, ইনহেলার হিসেবে পাওয়া যায়। তবে ছোট শিশুদের স্পেসারের মাধ্যমে ইনহেলার হিসেবে দেওয়াই ভালো কারণ এতে মুখে খাওয়ার চেয়ে অনেক কম ওষুধ লাগে তাই পাশ্বপ্রতিক্রিয়াও অনেক কম এবং সরাসরি যাওয়ায় অনেক কম সময়ে রোগী সুস্থ বোধ করে। যদিও অনেক অভিভাবক এই ইনহেলার পদ্ধতি পছন্দ করেন না। তাদের ধারনা ইনহেলার বড় মানুষদের জন্য এবং একবার ইনহেলার দেওয়া শুরু করলে সারা জীবন নিতে হবে। এ ধারণা কিন্তু একেবারেই ভুল। অনেক বা চা আছে যারা রোগের প্রারম্ভিক অবস্থায় ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী ইনহেলার নিয়ে সুস্থ্য আছেন এবং পরবতীতে আর ইনহেলার লাগে না । কিন্তু স্লেসারের মাধ্যমে যেকোনো বয়সের শিশুদের ইনহেলার দেওয়া যায়।

খ) প্রদাহ নিরাময়ের ওষুধ যেমন কর্টিকোস্টেরয়েড (বেকলোমেথাসন, ট্রাইঅ্যামসিনোলোন, ফ্লোটিকাসন) এগুলো ইনহেলার, রোটাহেলার, একুহেলার ইত্যাদিভাবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে এবং লিউকোট্রাইন নিয়ন্ত্রক- মন্টিলুকাস্ট, জাফিরলুকাস্ট ব্যবহার করা হয়।

3. এ্যালার্জি ভ্যাকসিন বা ইমুনোথেরাপি: এ্যলার্জি দ্রব্যাদি থেকে এড়িয়ে চলা ও ওষুধের পাশাপাশি ভ্যাকসিনও অ্যাজমা রোগীদের সুস্থ থাকার অন্যতম চিকিৎসা পদ্ধতি। এ পদ্ধতি ব্যবহারে কর্টিকোস্টেরয়েডের ব্যবহার অনেক কমে যায়। ফলে কর্টিকোস্টেরয়েডের বহুল পাশ্ব-প্রতিক্রিয়া যথা বারবার ইনফেকশন হওয়া, বৃদ্ধি না হওয়া, মুখ ও পেটে টসটসে লাল হওয়া থেকেও রেহাই পাওয়া যায়। বিশ্বের অধিকাংশ দেশ বিশেষ করে উন্নত দেশগুলোতে এ পদ্ধতিতে চিকিৎসা দেওয়া হয়ে থাকে। বর্তমানে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাও এই ভ্যাকসিন পদ্ধতি চিকিৎসাকে অ্যাজমার অন্যতম চিকিৎসা বলে অভিহিত করে। এটাই অ্যাজমা রোগীদের দীর্ঘমেয়াদি সুস্থ থাকার একমাত্র চিকিৎসা পদ্ধতি। বর্তমানে বাংলাদেশেও এ পদ্ধতিতে চিকিৎসা দেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়।

আগে ধারণা ছিল অ্যাজমা একবার হলে আর সারে না। কিন্তু বর্তমানে চিকিৎসা ব্যবস্থার যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে। প্রথম দিকে ধরা পড়লে এ্যলার্জি জনিত অ্যাজমা রোগ একেবারে সারিয়ে তোলা সম্ভব। অবহেলা করলে এবং রোগ অনেক দিন ধরে চলতে থাকলে নিরাময় করা কঠিন হয়ে পড়ে।

# পানিই জীবন বিশুদ্ধ যখন

জীবন ধারণের জন্য পানির প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করার অপেক্ষা রাখে না। মানুষের শরীরের শতকরা ৬০ ভাগ পানি। শরীরের প্রতিটি কোষের ভিতর ও বাইরে পানি দ্বারা পূর্ণ। একজন মানুষের প্রতিদিন প্রয়োজন ২০ থেকে ২৫ গ্যালন (প্রায় ১০০ লিটার) পানি। পানি বলতে বিশুদ্ধ পানিকে বোঝায়। কেননা পানি বিশুদ্ধ না হলে ডায়ারিয়া জাতীয় রোগ, হেপাটাইটিস (জন্ডিস), টাইফয়েড ও ক্রিমি জাতীয় রোগের সৃষ্টি করে স্বাস্থ্যহানি ঘটায়। তাই পানির ব্যাপারে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত। এ ছাড়া আর্সেনিক দূষণ হবার সম্ভাবনা থাকে (পরে আলাদাভাবে আলোচনা করা হবে)

একটা বিষয় গুরুত্বপূর্ণ তা হলো, কেবল খাবার পানি সিদ্ধ করে বা তথাকথিত বোতলের পানি আপনাকে পুরাপুরি নিরাপত্তা দেবে না। কেননা আপনি বোতলের পানি বা সিদ্ধ করা পানি পান করছেন কিন্তু ময়লা পানিতে হাত-মুখ বা বাসন ধুলে ভাইরাস বা জীবানু থেকে দুরে সরে আসা যায়না। তাই বলছি, **কেবল ফুটিয়ে পানি পানের উপদেশ স্বাস্থ্য সম্পর্কীয় সঠিক ও বাস্তবধর্মী উপদেশ নয়। এধরনের উপদেশ মানুষকে বিভ্রান্ত করে এবং করছে।**

প্রশ্ন আসে, অত্যাধুনিক পদ্ধতিতে পানি বিশুদ্ধ করার পরও কি পানি নোংরা হতে পারে? নোংরা হওয়া উচিত নয়। তবে কয়েকভাবে পানি নোংরা হতে পারে। যেমন : মূল ট্যাংক থেকে পানিবাহী নলে/পাইপে ফুটো হলে, বাসার ট্যাংক বা ঘরে সে গ্লাসে পানি পান করবেন যদি আগে থেকে নোংরা হয়ে পড়ে তবে যে ভাবেই বিশুদ্ধ করা হোক না কেন, সেটা আর বিশুদ্ধ পানির পর্যায়ে পড়বে না।

**কি করবেন?**

১. আপনার বাড়ির পানি কোন কোন প্যাথলজি ল্যাবে পরীক্ষা করে পানির মান বিষয় নিশ্চিত হতে পারেন।

২. অন্য উপায় হলো- পাইপ ওয়াটার ও ভূগর্ভস্থ ট্যাংক: পুরাতন পানি ট্যাংক থেকে বের করে দিতে হবে। ০.০৫% ক্লোরিন সলিউশন ট্যাংকের দেয়াল ধুয়ে দিতে হবে (প্রথমবার) ও পানি বের করে দিতে হবে। এরপর পুনরায় ট্যাংকে পানি ভর্তি করা যায়। পানির ভিতর ট্যাংকের সাইজ অনুসারে ব্লিচিং পাউডার মিশাতে হবে। পানি বিশুদ্ধ করতে ০.০৫% ক্লোরিন প্রয়োজন হয়। ক্লোরিনের সহজ উৎস হচ্ছে ব্লিচিং পাউডার।

**০.০৫% ক্লোরিন সলিউশন কিভাবে তৈরি করবেন?**

১০০ গ্রাম ব্লিচিং পাউডারে ৫ গ্রাম ক্লোরিন থাকে। ০.০৫% ক্লোরিন সলিউশন তৈরি করতে হলে এক লিটার পানিতে এক গ্রাম ব্লিচিং পাউডার গুলে নিতে হবে। অর্থাৎ আপনার ট্যাংক ১০০০ লিটারের হলে এক কিলোগ্রাম ব্লিচিং পাউডার মিশাতে হবে। মাসে একবার পানি বিশুদ্ধ করলেই চলবে। মনে রাখবেন, ব্লিচিং পাউডার আপনার ক্ষতি করবে না।

পানি বিশুদ্ধকরণ ট্যাবলেট নিয়ে বিভ্রান্ত হবেন না। পানি বিশুদ্ধকরণ ট্যাবলেট কেবল খাবার পানি বিশুদ্ধ করে ও দেশে পাওয়া যায় না। দাম বেশি হলেও পানি বিশুদ্ধকরণের ক্ষমতা ব্লিচিং পাউডারের সমান। পানি বিশুদ্ধকরণ ট্যাবলেটের দাম কয়েক শ' গুণ বেশি। একসঙ্গে পানি বিশুদ্ধ করতে বিরাট খরচ হবে। সেটিও ভাবতে হবে।

সবরকম কাজে বিশুদ্ধ পানি ব্যবহার করুন। সুস্থ থাকুন।

**– ডাঃ মোরশেদ চৌধুরী**